প্রকাশক—
শ্রীউপেন্দ্র নাথ বসু
১৬ বি, অশ্বিনী দত্ত রোড
কলিকাতা-২৯।

মুদ্রাকর ঃ—
শ্রীবাণী প্রেস,
১২৮, হাজরা রোড,
কলিকাতা-২৬।

ভূমিকা

প্রথম যেদিন শুনিলাম- বন্ধুবর ক্ষীরোদ চন্দ্র ঘোষ হঠাৎ বিমান যানে একাকী ইউরোপ ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন—একটু-আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলাম। কারণ তাঁহার বয়স ৬০ এর উপর এবং জীবনে এই প্রথম দূরদেশে বিমান যাত্রা। আর একদিন বিস্মিত হইয়াছিলাম যেদিন প্রথম শুনি যে তিনি নিজের প্রকাণ্ড বসতবাড়ীতে নিজ পিতামাতার নামে জগত-গঙ্গা সেবাসদন শিশুমঙ্গল সূতিকাগার ও হাসপাতাল করিয়া দিয়া এবং উহার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য—কয়েক লক্ষ টাকা দান করিয়া নিজে একটি ছোট ভাড়া বাড়ীতে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে শ্রীঘোষের জীবনধারা ও চরিত্র সাধারণের মত নয়। উহাতে বৈশিষ্ট্য আছে এবং যাহারা তাঁহার সহিত পরিচিত তাহারা সকলেই এই বৈশিষ্ট্যের কথা জানেন এবং তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন।

এই ইউরোপ ভ্রমণের দৈনন্দিন ডায়েরি পড়িলেই বুঝা যায়-ইহা ছাপানর জন্য লেখা হয় নাই। শ্রীঘোষের অনেক বন্ধুর আগ্রহে ও অনুরোধে ইহা পুস্তিকা আকারে বাহির হইতেছে। বিক্রয়-লব্ধ সমস্ত অর্থই জগত-গঙ্গা সেবাসদন শিশুমঙ্গল হাসপাতালের তহবিলে যাইবে।

এই ডায়েরিতে কোন পাণ্ডিত্য বা গবেষণা নাই। যখন যে দেশ, শহর বা সংস্থা তিনি দেখিয়াছেন—ইহাতে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে। আর সেই দৃশ্যাবলী- তাঁহার মনে যে আনন্দ, বিস্ময় বা দুঃখ সৃষ্টি করিয়াছে তিনি তাহাই নিজের ভাষায় প্রকাশ

করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইউরোপের সর্ব্ব বিষয়ে বর্ত্তমান উন্নতির মূলে রহিয়াছে—পুরুষ-স্ত্রী—বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীর অসীম কর্ম্মানুরাগ ও অক্লান্ত কর্ম্মব্যস্ততা তাহা শ্রীঘোষের চক্ষে ধরা পড়িয়াছে এবং তিনি ইহার উপর বিশেষ জোর দিয়া ভালই করিয়াছেন।

আমি আশা করি শ্রীঘোষের এই সংক্ষিপ্ত ইউরোপ ভ্রমণ-কাহিনী এ দেশে বহুল প্রচার লাভ করিবে।

১৮, অশ্বিনী দত্ত রোড,
বালিগঞ্জ।
৪ঠা কার্ত্তিক, ১৩৬১ সাল।

শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য


PALAIS DE VERSAILLES

৮ই জুন ১৯৫৪, মঙ্গলবার বেলা ৩টায় গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল হইতে এয়ার ইণ্ডিয়ার গাড়ীতে দমদম বিমান বন্দরে যাইব মনে করিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইলাম। কিন্তু প্লেন দেরীতে আসিবে জানিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। আবার বাড়ী হইতে ৭ টায় রওনা হইয়া দমদম আসিলাম। রাত্রি ৯ টায় বিমান ছাড়িল। রাত্রি ১-৪৫ মিনিটে বম্বে পৌছিয়া এয়ার ইণ্ডিয়ার গাড়ীতে প্রসিদ্ধ তাজমহল হোটেলে রাত্রি ২-৫৫ মিনিটে পৌছিলাম এবং একটি ঘরে শয়ন করিয়া বাকি রাত্রিটুকু কাটাইলাম। প্রাতে চা পান করিয়া কাপড় জামা পরিতেছি এমন সময় টেলিফোন আসিল "শীঘ্র ট্রানস্ ওয়ার্ল্ড এয়ার লাইন অফিসে আসুন।" তাজমহল হোটেলের নীচেই ঐ লাইনের অফিস। সেখানে গিয়া জানা গেল বিমানটি সৌদি-আরাবিয়া হইয়া যাইবে। কাজেই ভিসা লাগিবে এবং তাহার জন্য ২০৲ টাকা দিতে হইল।

৯ই জুন বুধবার সন্ধ্যা ৬ টায় অফিসে কাষ্টম ও পাস পোর্ট ইত্যাদি চেক্ হওয়ার পর বিমান ছাড়িল। পথে অনেক বিমান বন্দরে থামিয়া অবশেষে রোম বিমান বন্দরে ১০ই জুন বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টায় পৌছিলাম।

আমার ভ্রমণের সকল বন্দোবস্তের ভার কুক কোম্পানির উপর দেওয়া হইয়াছিল। তাহাদের লোকের সাহায্যে হোটেলে পৌছিয়া অর্দ্ধ-সিদ্ধ ফেন যুক্ত দুইটি ভাত ও ডিম সিদ্ধ খাইয়া ঘুম দিলাম। বেলা ৩ টায় কুক কোম্পানির অফিসে পায়ে হাটিয়াই যাত্রা করিলাম। প্রায় দুই মাইল পথ—যাহাকে জিজ্ঞাসা করি কেহই ইংরেজি বুঝে না। বিষম ভাষা বিভ্রাট। বাংলা দেশের লোক ওয়ালটেয়ার কিংবা মাদ্রাজ গেলে যে প্রকার ভাষা বিভ্রাটে পড়ে ঠিক সেই প্রকার; শুধু আমার নয়—ইংরেজ

আমেরিকান্—সকলেরই এক অবস্থা। যাহা হউক কুক কোম্পানির অফিসে যাওয়া মাত্র তাহারা ১০ পাউণ্ডের বদলে লিরা দিলেন। লিরা হ ইটালির প্রচলিত মুদ্রা। ১৭৩৫ লিরায় ১ পাউণ্ড। কমিশন বাদ দিয়া ১৫৫০ লিরায় পাউণ্ড হিসাবে পাওয়া গেল এবং পর দিন ১১ই জুন শুক্রবার সকাল বেলা ৯ টার মধ্যে হোটেলে কাপড় জামা পরিয়া প্রস্তুত থাকিতে বলিল।

পরিষ্কার আকাশ—সূর্য্যের আলোকে ১১ই জুন শুক্রবার রোম শহর দেখিতে গেলাম। "Rome was not built in a day" ইংরেজিতে একটা প্রচলিত কথা আছে। রোম দেখিয়া তাহার অর্থ কিছুটা উপলব্ধি করিলাম। গাইড বুঝাইলেন—চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে সেণ্ট পিটারের গির্জ্জা নির্ম্মিত হইয়াছে। দেখিবার মতই বটে, কত যে কারুকার্য্য, কত তৈল চিত্র, কত বড় মণীষীদের ছবি। কত পুরাতন, কিন্তু দেখিলে মনে হয় যেন একেবারে নূতন। শিল্পী বোধ হয় এই মাত্র কাজ শেষ করিয়াছেন. একটি তৈল চিত্র সুনিপুণ শিল্পী ৫০ বৎসর সাধনা করিয়া তবে শেষ করিয়াছিলেন। কি অসীম ধৈর্য্য, স্বচক্ষে না দেখিলে কেহই সম্পূর্ণভাবে ধারণা করিতে পারিবেন না। দিনে শীত মোটেই নাই—ঠিক যেন আমাদের দেশের ফাল্গুন মাস। রাত্রে কিছু শীত বোধ হইল।

১২ই জুন শনিবার ভ্রমণকারীদের জন্য নির্দ্দিষ্ট গাড়ী আসিলে শহর দেখিতে গেলাম। সমস্তই গাইড বুঝাইলেন: কত বড় বড় বাগান, সাধারণের জন্য উদ্যান, মুসোলিনির বাড়ী, পোপের বাড়ী, আরও কত বড় বড় বাড়ী। এক একটি বাড়ী বহু কামরা বিশিষ্ট পার্ব্বত্য অঞ্চল ভগবানের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

১৩ই জুন রবিবার আবার গাড়ী আসিল। গ্রামের রাস্তার

টিভোলি নামক শহরে গেলাম। বহু উচ্চ পাহাড়—সেখান হইতে জলরাশি প্রচণ্ড বেগে নিম্নদিকে পতিত হইয়া সমতল ভূমিতে এক একটি হৃদ তৈয়ারী করিয়াছে। ঐ স্থানে প্রায় ১০ হাজার লোকের সমাগম। ইংরেজ, আমেরিকান, থাইল্যাণ্ড ও স্পেনের অধিবাসী আর স্থানীয় ইটালির লোকত আছেই। বেলা ১টা অবধি সব দর্শণীয় স্থান দেখাইয়া গাইড আমাদের হোটেলে লইয়া গেলেন। চমৎকার দৃশ্য—পরিষ্কার আকাশ ও রৌদ্র—আনন্দে সকলেই সহাস্য বদনে খাইতে বসিলাম। আমি খাইলাম ভাত আর ডিমের কারি। সকলের সামনেই এক এক বোতল মদ, উহা আমাদের দেশের পানীয় জলের মতন। মদ খুব সস্তা, ১২ আউন্স বোতলের দাম ১৭৫ লিরা অর্থাৎ প্রায় ২।০ মাত্র। ছুটির সময় বহু যুবক যুবতী ইটালিতে আনন্দ উপভোগ করিতে আসে। রাত্রে সিনেমা, নাচ ইত্যাদি দেখিতে যায়। আমি ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া ডায়রি লিখি। অনেক গির্জ্জায় এমন কি গির্জ্জার বাহিরেও দেখিয়াছি গির্জ্জার ঘন্টা বাজিবামাত্র সাহেব মেমরা হাঁটু গাড়িয়া প্রার্থনা করিতে বসিয়া পড়িল। প্রথমে ইহা আমার নিকট অদ্ভুত মনে হইত।

১৪ই জুন সোমবার আমাদের গাড়ীতে সকাল বেলা রোম হইতে ফ্লোরেন্স রওনা হইলাম। কি দৃশ্যই দেখিলাম—দুই দিকে পর্ব্বত, পাহাড় মাঝখান দিয়া পিচের রাস্তা। গাড়ী কখনও ৩,০০০ হাজার ফিট্ উচ্চে কখনও সমতল ভূমিতে। রাস্তার দুইদিকে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ ও অন্যান্য নানাবিধ ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া যেন আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছে। সমতল ভূমিতে বহু বাগান ফল ফুল, শাক সবজীর চাষ। ঐ স্থানের চাষীর মেয়েরা, বৌরা সদা হাস্যময়ী যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় মুখখানি। চমৎকার পোষাক অথচ কম দামী। সকলে একত্রে বাগানের কাজ করিতেছে। উহাদের যেমন রূপ তেমনি স্বাস্থ্য।

আমাদের দেশের ভগ্নস্বাস্থ্য মেয়েদের কথা মনে পড়িল। এত সমস্ত মহিলারা নিজ হাতে কাজ করিতেছে। আমাদের দেশে আগাছা পরিষ্কার করিবার জন্য এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহার হয়। ঐ মহিলাদের হাতেও সেই প্রকার যন্ত্র দেখিলাম। সন্ধ্যায় ফ্লোরেন্সে পৌঁছিলাম। রাত্রি সেখানে কাটাইলাম।

পরদিন ১৫ই জুন মঙ্গলবার গাড়ীতে ভেনিস রওনা হইলাম। আঁকা বাঁকা রাস্তা, সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। দুই দিকে ফুলের বাগান, হোটেল। আমি খেলাম ডিমের মামলেট, পাউরুটি, মাখন ও পানীয় সাদা জল। রাস্তায় আসিতে আসিতে দুই জায়গায় আমি ছাড়া সকলেই নামিলেন ও পানীয় (মদ) গ্রহণ করিলেন। সাড়ে ৭টায় ভেনিসে পৌঁছিলাম। কুক কোম্পানির লোক উপস্থিত ছিলেন। ৫ মিনিট হাটিয়া তাহাদের সঙ্গে গেলাম। সামনে একটি প্রকাণ্ড খাল। খালে মোটর বোট এবং ঐ দেশীয় বহু নৌকা আছে। আমাকে একটি মোটর বোটে তুলিয়া কুক কোম্পানির লোক চলিয়া গেলেন। মোটর বোট চলিল, কি চমৎকার ব্যবস্থা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বসিবার জন্য রাজকীয় কৌচের ব্যবস্থা। ২০ মিনিট বোট চলার পর Splendid নামক হোটেলে পৌঁছিলাম। হোটেলে আমার ঘরে পৌঁছিবার কিছু পরেই ডিনার আসিল। পাউরুটি, মাখন, ডিম খাইয়া শুইয়া পড়িলাম। সকালে গির্জ্জা দেখিতে গেলাম, ঠিক রোমের গির্জ্জার মত কারুকার্য।

ভেনিসে ১৬ই জুন বুধবার হইতে ১৮ই জুন শুক্রবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সকাল বেলায় ব্রিস্কে উপসাগরের তীরে যাইতাম আর দেখিতাম ছোট ছোট নৌকা, ষ্টীমার, মোটর লঞ্চ প্রভৃতি চড়িয়া আরোহীরা উপসাগরের মাঝখানে যাইতেছে। নৌকা যেন নাচিতেছে, ছোট ছোট

ঢেউএর সঙ্গে তালে তালে উঠিতেছে ও পড়িতেছে। কি আনন্দ—গাইড সঙ্গে আছেন। প্রত্যেক নৌকায় ৫ জন আরোহী। লেক অপর পারে প্রকাণ্ড গির্জ্জা। সন্ধ্যায় সহস্র সহস্র নৌকায় আলো জ্বলিতেছে। এই সকল দেখিয়া আমার ১৯০৭/৮ সালের কথা মনে পড়িল—পদ্মার উপর গোয়ালন্দের দৃশ্য। সহস্র সহস্র দেশী নৌকা ও ছোট ছোট ডিঙ্গিতে আলো জ্বলিত। শীতকালে পদ্মার জল আর ভেনিসের লেক জল ঠিক একই রকম স্বচ্ছ। একই রকম ছোট ছোট নৌকাতে আলো। আমার সাথে একজন আমেরিকান সাহেব ছিলেন। তিনি বলিলেন "কি চমৎকার দৃশ্য Mr. Gosh"। ভেনিস একটি নূতন রকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শহর। গলিতে গলিতে বড় বড় দোকান। যে দিকে যাবেন খাল আর খাল। এবাড়ী ওবাড়ী—এরাস্তা ওরাস্তা কেবলই আপনাকে খাল দিয়া নৌকায় যাইতে হইবে অথবা বিপরীত দিক দিয়া মাটির উপর দিয়া চলার রাস্তায় পায়ে হাটিয়া যাইতে হইবে। গত যুদ্ধে ভেনিসের কিছুই নষ্ট হয় নাই। কারণ ইহাকে খোলা শহর (Open City) অর্থাৎ যুদ্ধ কালে আত্মরক্ষার অপ্রস্তুত ও অক্ষম ঘোষণা করা হইয়াছিল। ভেনিসের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই।

১৯শে জুন শনিবার ৯ টার সময় দেখি একখানা মটর বোট হোটেলে আমাকে নিতে আসিয়াছে। বোটে উঠিলাম, সঙ্গে মাত্র একটি স্যুটকেস। মটর বোট সটান খালদিয়া আসিয়া ভেনিস রেল ষ্টেশনের নিকট থামিল। এজেন্টের লোক ছিল, রেলের টিকিট আমার সঙ্গেই ছিল। আমার জন্য টিকিটের বই ইত্যাদি আগেই এজেন্ট রোমে আমাকে দিয়াছিলেন। কাজেই কোথাও রেলের টিকিট, বিমানের টিকিট বা হোটেলের ব্যবস্থা আমায় করিতে হয় নাই। ট্রেণ ১১টায় ছাড়িল। মিলানে আসিয়া গাড়ী বদল করিয়া জুরিকের গাড়ীতে উঠিলাম। ট্রেণ

ছাড়িল, কয়েক ঘণ্টা পরে ইটালির এলাকা ছেড়ে সুইজারল্যাণ্ডের এলাকায় আসিলাম। পাশ্চাত্যে ছুটির দিন মানেই হচ্ছে রাস্তায় রাস্তায় আড্ডা দেওয়া ও মদ খাওয়া। রাত্রি ১০-১০ মিনিটে জুরিকে পৌছিলাম। হোটেলের লোক ষ্টেশনে উপস্থিত ছিল, কোনই কষ্ট হয় নাই।

পরের দিন ২০শে জুন, রবিবার, সকালে বাহির হইলাম সামনেই প্রকাণ্ড খাল। বড় হ্রদ হইতে খাল বাহির হইয়া শহরের বুকের উপর দিয়া গিয়াছে। উভয় পারেই বড় বড় দোকান, হোটেল ও ছোট ছোট পাহাড়। হোটেল হইতে রেল ষ্টেশন খুব নিকটে। টুরিষ্ট গাড়ীতে দেশ দেখিতে বাহির হইলাম। তিন দিকে আবার সেই পাহাড়, খাল, উদ্যান ও হ্রদ। তারপর একাকী ট্রামে বসিয়া অনেক স্থান ঘুরিয়া অনেক দৃশ্য দেখিলাম। জুরিকে বড় বড় ট্রামের ষ্টেশন আছে এবং ট্রামে উঠিয়া বুকিং ক্লার্কের নিকট হইতে টিকিট লইতে হয়। বুকিং ক্লার্ক ট্রামেই বসিয়া থাকে। ট্রামও দেখিতে চমৎকার নানা বর্ণের। যেন সুনিপুণ চিত্রকর নানা রঙ দিয়া গাড়ীগুলি চিত্রিত করিয়াছেন। যাহাদেখি তাহাই নয়ন আনন্দদায়ক, মনোরম। আমাদের দেশের শহর নির্ম্মাতাদের উচিত এই সব শহর ভাল করিয়া দেখিয়া, শিখিয়া ও বুঝিয়া নূতনভাবে নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী শহর তৈয়ারী করার চেষ্টা করা। "কল্যাণীর" কথা মনে করায় দুঃখ হইল। আরও দুঃখ হইল এই ভাবিয়া যে "কল্যাণীকে" যাঁহার মানসী কন্যা বলা হয়—সেই ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় কতবার জুরিক ও অন্যান্য শহর দেখিয়া গিয়াছেন।

ট্রামের ষ্টেশনগুলি অতি সুন্দর। ৩০০-৪০০ ফুট লম্বা। সুন্দর বেঞ্চ---পিছনে ৮ ফুট × ৪ ফুট বড় বড় সুন্দর কাচ লাগান। উপরে ঢালাই ছাদ খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। দিনের পর দিন দেখিলাম একখানি কাচও ভাঙ্গে নাই, নষ্ট হয় নাই, চুরি হয় নাই। ট্রামে নম্বর দেওয়া

আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা জানে কত নম্বর ট্রামে যাইতে হইবে। যেদিকে দৃষ্টি যায় কেবল হোটেল, খাওয়ার সুব্যবস্থা, ফলের দোকান, জুতার দোকান, ঘড়ী ও কাপড়ের দোকান। ইচ্ছা হইত যদি জুরিক শহরটি কলিকাতায় আনিতে পারিতাম, কতই না আনন্দ হইত। পাহাড়ের নিম্নে সমতল ভূমিতে অনেক টালির বাংলো, নীচেই হ্রদ। গাইড বলিলেন বাংলোতে স্বাস্থ্যের জন্য বড় বড় লোকেরা বাস করেন। উপরে পাহাড়, নিম্নে হ্রদ, মাঝখানে বাংলো, কি মনোরম দৃশ্য।

২৪শে জুন বৃহস্পতিবার বৈকাল ৫টায় ভিয়েনা যাওয়ার জন্য বিমান বন্দরে গেলাম। যথা নিয়ম পাসপোর্ট ইত্যাদি দেখানর পর বিমান ছাড়িল ও রাত্রি ৮।২০ মিনিটে ভিয়েনায় পৌঁছিলাম। ভিয়েনায় এসে ভাল হোটেলে স্থান পাইলাম। ব্যবস্থা আগেই করা ছিল। মনে রাখা উচিত যে পাশ্চাত্য দেশে আগেই বাসস্থান ঠিক করিতে হয়, নতুবা বাসস্থান পাওয়া যায় না, মহা বিপদে পড়িতে হয়। ভিয়েনায় দেখিলাম, দিনে গরম রাত্রে শীত—ঠিক বাংলা দেশের বসন্তকাল। সৌভাগ্য-ক্রমে দিনে বৃষ্টি ছিল না—রাত্রেও পরিষ্কার আকাশ।

২৫শে জুন শুক্রবার বিমান বন্দর হইতে রাত্র ৯টায় হোটেলে পৌঁছিলাম। সকাল ৮।৩০ মিনিটে কুক কোম্পানির অফিস হইতে ভ্রমণকারীর চেক ভাঙ্গাইয়া অষ্ট্রিয়ার শিলিং লইলাম। তারপর ট্যাক্সি করিয়া ভারতীয় দূতাবাসের অফিসে গেলাম। ঐ অফিসে চাটার্জ্জি মহাশয় ও আয়েঙ্গার মহাশয় আমার সঙ্গে কি মধুর ব্যবহার করিলেন—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। চক্ষু দেখাইবার জন্য ডাক্তারও ঠিক করিয়া দিলেন, ঐ দিন ছয়টায়। তারপর হোটেলে ফিরিলাম বেলা ১টায়। আবার বৈকাল ছয়টায় ডাক্তারের নিকট গেলাম, খুব ভালভাবে পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার

বলিলেন "বয়সের জন্য এইরূপ হইয়াছে। এই চশমাই ব্যবহার করুন। এখন চশমা বদলাইবার দরকার নাই। পরে ছানি পড়িলে অস্ত্র করিতে হইবে।"

২৬শে জুন, শনিবার, প্রাতঃকালে আবার বাহির হইলাম। বড় বড় রাস্তা, উদ্যান, বাগান, টাউনহল হাটিয়া হাটিয়া দেখিলাম। খুব বড় একটি রাস্তা—প্রায় ৪০০ ফুট চওড়া—দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইলাম। দুধারে কি চমৎকার সারি সারি পাইন গাছ—যেন রাস্তা নয়, বাগান। ইটালি হইতে আরম্ভ করিয়া ভিয়েনা পর্য্যন্ত রাস্তায় সকল গাড়ীই ডান দিক দিয়া যায়। আমাদের দেশের মতন বাম দিক দিয়া যায় না। রাস্তাঘাট নির্জ্জন পার্ক, সাজান দোকান দেখিতে দেখিতে হোটেলের রাস্তাই হারাইয়া ফেলিলাম। আর হোটেলে পৌঁছিতে পারিনা। রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করিলে কেহই আমাকে বলিয়া দিতে পারেনা। ভাষা বিভ্রাট, সাধারণ লোকে কেহ ইংরেজি জানেনা—বলিতেও পারেনা। সকাল বেলা ৯টায় পোষ্ট অফিসে গেলাম। কত কেরানী কাজ করিতেছে দেখিলাম। সকলেই স্ত্রীলোক কিন্তু কেহই ইংরেজি বুঝিতে পারেনা। ইসারায় হাত নেড়ে বুঝাইলে বুঝে, পোষ্টকার্ড দিল। এয়ারমেল টিকিট পোষ্টকার্ডে লাগাইয়া সীল দিয়া ঠিক করিয়া ভারতে যাইবে সেই স্থানে রাখিল। কোন বিরক্তি নাই। এইখানে মনে পড়িল ষ্টার থিয়েটারের বোবা মেয়ে শ্যামলীকে। বুঝে সব, কিন্তু ভাষা নাই। বলিতে পারে না। কত যে "শ্যামলীকে" দেখিলাম তাহার ঠিক নাই। পথ ভুলিয়া গিয়াছিলাম—তাই অনেক কষ্টে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেলা ১২টায় হোটেলে ফিরিলাম। তার পর স্নান ও কিছু ফলাহার করিয়া ডায়েরি লিখিতে বসিয়া গেলাম। বেলা ৫টায় চাটার্জ্জি মহাশয় দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। অনেক আলাপ আলোচনা করিলাম। ভিয়েনায় কি কি দেখিব তাহার একটা লিষ্ট করিলাম।

পর দিন ২৭শে জুন রবিবার ৯।৩০ মিনিটে গাড়ী করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া বড় বড় রাস্তা, বাগান, উদ্যান ইত্যাদি দেখিলাম। একস্থানে ৭টি রাস্তা মিশিয়াছে তাহাও দেখিলাম। একটি ছোট কৃত্রিম খাল দেখিলাম। ছোট বড় কোন হ্রদ নাই। একটি বাড়ীর ভিতর গিয়া অনেক নীচে নামাইয়া নিয়া গাইড ভিয়েনার বহু পুরাতন স্মৃতি জড়িত মেমোরিয়াল পাশাপাশি কবর দেখাইলেন। তারপর একটি মিউজিয়াম দেখাইলেন। ঢুকিয়াই সমতলভূমি, তারপর একে একে যাহা দেখিলাম তাহা এই—ঘাসে ঢাকা ছোট পাহাড় খাড়া ভাবে উঁচু উঠিয়াছে। তাহার চারিদিকে গাছ পালা ও লতা পাতায় ঢাকা সুন্দর ছোট পাহাড়। একমাত্র আমি ছাড়া বহু দর্শক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ছবি তুলিতে লাগিলেন। আমার না আছে ক্যামেরা—না জানি ছবি তুলিতে। অপরের ছবি তোলা দেখিতে লাগিলাম।

ভিয়েনা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ স্থান। কি রাস্তায়, কি উদ্যানে, চারিদিকেই গাছ পালা লতা পাতায় যেন সাজাইয়া রাখিয়াছে। তারপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী, মিউজিয়ামে বহুবিধ ছবি, খুব বড় বড় এবং নানাবিধ কারুকার্য্য বিশেষভাবে দর্শনীয়। গাইড বলিলেন এই মিউজিয়মের বাড়ীতে ১২৪৫টি কক্ষ আছে। বড় বড় কক্ষে সুনিপুণ শিল্পী কাজে মগ্ন ছিলেন, সাধনায় তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। প্রথমে কঠোর সাধনা—তারপর সিদ্ধি। ইঞ্জিনিয়ারদের কি সুনিপুণ কাজ। শুধু বাহিরের সাজ-সজ্জা দেখিলেই চক্ষু তৃপ্ত হইবে। বাংলার তরুণ, শিক্ষিত ও মেধাবী ছাত্রদের দলে দলে আসিয়া রোম হইতে ভিয়েনা পর্য্যন্ত এই সব দেশ ও শহর ভাল করিয়া দেখা কর্ত্তব্য ও ইহাদের শিল্পকলা, স্থাপত্য, শহর নির্ম্মাণ কৌশল ইত্যাদি শিক্ষা করা দরকার।

মনে পড়িল আমাদের দেশের কথা। আমরা এখনও কত পিছনে পড়িয়া আছি। হায়রে আমাদের ইডেন গার্ডেন। ১৯০৮ সালে প্রথম

কলিকাতায় আসিয়া কি দেখিয়াছিলাম, আর এখন উহা কি হইয়াছে। কলিকাতার ইডেন গার্ডেন অর্থলোভে যাহারা ধ্বংস করিয়াছে তাহারা দেশের ও জাতির যে কি ক্ষতি করিয়াছে—এদেশে আসিলে তাহা বুঝা যায়। আমার মতে বাংলার জাগ্রত জনসাধারণের, সরকারের নিকট একবাক্যে দাবী করা উচিত "আমাদের ইডেন গার্ডেন—আবার ইডেন গার্ডেন করিয়া ফিরাইয়া দাও এবং ভ্যাণ্ডাল (ধ্বংসকারী) দের সমুচিত শাস্তি বিধান কর"। আগামী কাল ২৮শে জুন সোমবার টুরিষ্ট গাড়ী বন্ধ। ২৯শে জুন মঙ্গলবার আবার বৈকালে গাড়ী আসিবে।

সোমবার সকাল ৯টায় ডাক্তার রামস্বামীকে টেলিফোন করিয়া নেতাজীর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিবার চেষ্টা করিলাম। আগেও চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিন্তু যোগাযোগ হয় নাই। এবার ঠিক হইল আগামী বৃহস্পতিবার বেলা ২টায় ভারতীয় দূতাবাসে তিনি আসিবেন—সেখানে দেখা হইবে। সকাল নাই, দুপুর নাই, বিকাল নাই—কখনও পায়ে হাঁটিয়া—কখনও ট্রামে ঘুরিতেছি। যখন পথ ভুলিয়া যাই তখন ট্যাক্সি করি। ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বভাবের সৌন্দর্য্য দেখি। পায়ে হাঁটিয়া না দেখিলে কোন জায়গা ভাল করিয়া দেখা হয় না। আঁকা বাঁকা ও সোজা চওড়া রাস্তা, সারি সারি বৃক্ষ লতা পাতা সম্বলিত উদ্যান—ঠিক যেন বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের তমাল তালের কুঞ্জ।

২৯শে জুন মঙ্গলবার বেলা ৩ টায় গাড়ী করিয়া বাহির হইলাম। আবার গাইড দেখাইলেন বড় বড় সৌধ, বহু পুরাতন স্মৃতি জড়িত। আবার সেই পার্ক—সেই বৃক্ষাদি পরিপূর্ণ লতা কুঞ্জ, দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল। তারপর গাড়ী শহরের বাইরের রাস্তায় চলিল। দেখিলাম ডান দিকে রেলের লাইন, তার নীচেই নদী ও নদীর অপর পারে সমতল ভূমি ও ছোট খাল। তারপর গাড়ীতে বসিয়া দেখিলাম দুই দিকেই পর্ব্বত, মাঝখান দিয়া নীচের

চমৎকার রাস্তা। গাড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদিগকে পর্ব্বতের উপর লইয়া গেল। সেখান হইতে পায় হাঁটিয়া আরও উচ্চ শিখরে লইয়া গাইড বুঝাইলেন এইটি ভিয়েনার কাঠের পর্ব্বত। পাইন গাছ ও ওক গাছ ভর্ত্তি। কত যে গাছ—মনে হয় যেন যুগ যুগান্ত ধরিয়া কাটিলেও উহা শেষ হইবে না। নীচের দিকে তাকাইলে মনে হয় আমরা বহু উচ্চে ২৫০০ ফুটের কম নয়। নিম্নে ছোট ছোট খাল, সমতল ভূমি, শস্য ক্ষেত্র। এই যে অরণ্য—আমাদের জীবনে ইহা কত আবশ্যক তাহা আগে আমরা বুঝিতে পারি নাই। উপর হইতে নীচে নামিলেই আবার বড় বড় বাগান, পার্ক, গির্জ্জা, চা খাওয়ার সুন্দর স্থান। তাহার নীচে সমতল ভূমি ও তাহার নীচেই ছোট খাল। গাড়ী ভর্ত্তি টুরিষ্ট—ইংরেজ, আমেরিকান, ইটালীয়, ভারতীয় সকলের মুখে একই কথা 'অতি সুন্দর'। দেখিলাম বড় বড় বাড়ী, পাহাড়, পর্ব্বত, গাছের বন, লতা পাতা জড়িত কুঞ্জ ও নদী, খাল, হ্রদ, এই-গুলিই হচ্ছে পৃথিবীর দর্শনীয় জিনিষ। মনে হইল বাংলাদেশে এই সব জিনিষের অপূর্ব্ব সমাবেশ— কিন্তু সেগুলিকে জগৎবাসীর দর্শনীয় করিয়া রাখার সুবন্দোবস্ত আমরা এখনও করিতে পারি নাই। সন্ধ্যায় আমরা ফিরিয়া আসিলাম, যার যার গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলাম।

আজ ৩০শে জুন রবিবার ২।৩০ মিনিটে আবার গাড়ীতে চলিলাম, গাইড জানাইলেন, দক্ষিণ ভিয়েনায় যাইতেছি। আবার সেই পাহাড়, শস্ত ক্ষেত্র। পাহাড়ের মাঝখান দিয়া রাস্তা। গাড়ী আঁকা বাঁকা পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পাহাড়ের চূড়ার দিকে উঠিতেছে, আবার নামিতেছে, আবার থামিয়া আমাদের নামাইয়া গাইড পাহাড়ের চূড়ায় নিয়া নীচের দিকে দেখাইয়া সমস্ত বুঝাইলেন। ঐ রাস্তায় অনেক গির্জ্জা, হোটেল ও নানাবিধ দোকান আছে। সমস্ত দেখিয়া ফিরিবার পথে পল্লীগ্রামের রাস্তায় আসিলাম। দেখিলাম কৃষক ও কৃষকপত্নীরা মাঠে কাজ

করিতেছে। সকলেই কর্ম্মব্যস্ত, ঘড়ির কাঁটার মত সকলেই কাজ করিয়া যাইতেছে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—কি সুন্দর দেশ, চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—কাগজ টুকু ছিঁড়িয়া রাস্তায় ফেলিবার উপায় নাই। রাস্তায় লাইট পোষ্টের সাথে ছোট ছেঁড়া কাগজ রাখার পাত্র বাধা আছে—তাহাতে ফেলিতে হইবে। তখন আমার মনে পড়িল কলিকাতার লোহাপট্টির রাস্তা, বড় বাজারের রাস্তা, মিরবহর ঘাট ষ্ট্রীট, এদেশের তুলনায় ঠিক যেন নরক কুণ্ড। আমাদের মেয়র সাহেব শ্রীনরেশ নাথ মুখোপাধ্যায় ও প্রধান মন্ত্রী ডাক্তার বিধান চন্দ্র রায়ের ভিয়েনা দেখার পরও মিরবহর ঘাটের কোনই উন্নতি হয় নাই, চেষ্টাও হয় নাই। দুর্ভাগ্য কলিকাতার ও কলিকাতাবাসীর।

১লা জুলাই বৃহস্পতিবার। ঠিক বৃহস্পতিবারের শেষ বেলায় অনুমান ৫ টায় ভারতীয় দূতাবাসে আচার্য্য নরেন্দ্র দেব, তাঁহার সেক্রেটারি, নেতাজীর স্ত্রী ও আরও ২।১টি ভদ্র মহিলা, ডাক্তার রামস্বামী এবং আমি একত্রে মিলিত হইলাম। ডাক্তার রামস্বামী চায়ের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একত্রে সকলে চা পান করিতে করিতে আলাপ আলোচনা চলিল। আচার্য্যদেব হাঁপানির চিকিৎসার জন্য ভিয়েনাতে এসেছেন। তিনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন। একেবারে বুকে টানিয়া নিলেন। নেতাজীর স্ত্রীর সঙ্গে অতি অল্পই আলাপ হইল। শ্রীমতী বোসের সহিত আচার্য্যদেবের কোন কথাবার্ত্তা হইলনা—আমারও তাহাই। তাঁহার মেয়ের বয়স ১১ বৎসর। তিনি নিজে চাকুরী করেন। ভালই আছেন। বর্ত্তমান মেয়র শ্রীনরেশ নাথ মুখার্জ্জি মহাশয় শ্রীমতী বসুর নিকট বিশেষভাবে পরিচিত পত্রালাপ চলে। মেয়রের কথা বলিলাম ও আমার সঙ্গে তাঁহার যে ব্যবসা সম্বন্ধ আছে তাহাও তাঁহাকে বলিলাম। তাঁহাকে খুব অল্পভাষী মনে হইল।

প্রায় ২ ঘণ্টা আমাদের চায়ের মজলিশ ছিল। তারপর আমি

চাটার্জ্জি মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার বাসায় গেলাম। তাঁহার স্ত্রী আমাকে চা খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিলেন ও খুব আদর যত্ন করিলেন। আমি এই মাত্র চা পান করিয়া আসিয়াছি বলাতে এক কাপ দুধ দিলেন—খাইলাম। এখানে খুব আন্তরিকতা দেখিলাম।

ডাক্তার রামস্বামীও বিশেষভাবে আমাদের আদর যত্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার ভদ্র ব্যবহার ভুলিবার নয়। তিনি ছুটী নিয়াছেন, ৬ই জুলাই ভারতে ফিরিবেন।

আজ ২রা জুলাই, শুক্রবার। সকাল বেলা হইতেই টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘরের বাহির হওয়া যায় না। ভয়ানক শীত, দুইবার রাস্তায় বাহির হইয়া ডাক ঘরে গিয়াছিলাম। আমার মুখ পর্য্যন্ত শীতে ঠাণ্ডা হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিয়া ঘরে কম্বল গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলাম। আর বাহির হই নাই।

আজ ৩রা জুলাই, শনিবার। আকাশ অনেকটা পরিষ্কার। আমারও কোথাও যাইবার বা দেখিবার আজ কিছুই নাই। আগামী কাল রবিবার ভোর ছয় টায় মিউনিক যাইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

৪ঠা জুলাই রবিবার সকাল ৯টায় মিউনিক পৌছিয়া হোটেলে আছি। খুব শীত। বেলা ১টায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঘরের বাহির হওয়া নূতন লোকের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর। তবুও বৈকাল ৩টায় বাহির হইয়া মিউনিক রেল-ষ্টেশন দেখিলাম। কি সুন্দর ব্যবস্থা, প্রকাণ্ড ষ্টেশন, উহার মধ্যেই হোটেল, দোকান যেন ছবির মতন। ফলে, ফুলে, বই কাগজে সাজান। খুব বিক্রি অথচ দামও বেশী। টুরিষ্ট গাড়ী কখন ছাড়ে—কোথায় যায়—সমস্ত খবর নিয়া হোটেলে ফিরিলাম।

৫ই জুলাই সোমবার সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে শহর দেখিতে চলিলাম। কি দৃশ্যই দেখিলাম—বড় বড় গির্জ্জা ও বাড়ীর ভগ্নস্তূপ মেরামত

হইতেছে। গত যুদ্ধে মিউনিকের খুব বেশী ক্ষতি হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাগার—পুস্তকাগার, বড় পার্ক, লতা পাতা গাছ যেন সারি সারি সাজান রহিয়াছে। একটি ছোট নদী শহরের বুকের উপর দিয়া গিয়াছে। নদীর দুই দিকেই রাস্তা ও বৃক্ষরাজি। মাঝে মাঝে বসিবার স্থান, বিশ্রাম করিবার স্থান, হোটেল আর দোকান। এত দোকান ও এত বেশী হোটেল কি করে চলে— চিন্তা করিয়া ঠিক করিতে পরিলাম না। ইটালিতে, সুইজারল্যাণ্ডে, কিংবা মিউনিকে রিক্সা কিংবা গরু মহিষের গাড়ী দেখিলাম না। কিন্তু খুব বড় ও ভাল ভাল ঘোড়ায় মালের গাড়ী বহন করে। ঘোড়াগুলি ঠিক আমাদের দেশের রেসের ঘোড়ার মত দেখিতে। এখানেও ভাষা বিভ্রাট, একমাত্র জারমান ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষা কেহ বুঝে না বা বুঝিতে চেষ্টাও করে না। ভিয়েনাতেও জারমান ভাষা। স্থানীয় লোকের ব্যবহার খুব ভাল। ভারতীয়দের সহিত খুব ভাল ব্যবহার করে। এখানেই আমেরিকান টুরিষ্টদলের সহিত দেখা হইল। সকলেরই সঙ্গে ক্যামেরা, ফটো তোলায় বিশেষ উৎসাহ দেখিলাম। আমেরিকানদের টাকার অভাব নাই। কি ভাবে খরচ করে না দেখিলে কেহই বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু প্রকৃতির পরিচয়—বৃক্ষ, লতা, নদী, খাল, লেকের ভিতর দিয়া স্পষ্ট পাইলাম। রোম হইতে আরম্ভ করিয়া মিউনিক পর্য্যন্ত সকল জায়গাতেই বাগান, বৃক্ষ, লতা, ফল-ফুলে শোভিত। বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়, কত পুস্তক, কত ঋষিতুল্য বড় বড় কবি ও লেখকের লিখিত পুস্তক—অতুলনীয় দান। মিউনিক ধ্বংস হইয়াছিল—কতক মেরামত হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। ১১৫৫ সালে মিউনিক শহর প্রতিষ্ঠিত হয়। যে হলে বসিয়া একদিন হিটলার ও মুসোলিনী যুক্তি পরামর্শ করিতেন তাহা গাইড দেখাইয়া দিলেন—বুঝাইয়া দিলেন। কত যে দুঃখের স্মৃতি জড়িত তাহা বলিলেন। আমেরিকানদের দখলে এখনও অনেক বড় বড় অট্টালিকা,

অফিস এখানে রহিয়াছে। তাহাদেরও এখানে কিছু কিছু অধিকার আছে।

অদ্য মঙ্গলবার ৬ই জুলাই হাইডেনবার্গে বেলা ১।৩০ মিনিটে পৌছিলাম। ট্রেন আঁকা বাঁকা রাস্তায় পাহাড়ের কোল দিয়া চলিল। দুই দিকেই পাহাড়—পাহাড়ের গায়ে শত সহস্র বাড়ী। দোচালা টালির ঘর। প্রত্যেক ঘরেই দেখিলাম শীতকালের জন্য আগুন জ্বালানর সুব্যবস্থা আছে। লোকের বসতি অফুরন্ত। গাছের সঙ্গে লতা পাতা জড়ান দৃশ্য—আবার নীচেই খাল বা ছোট ছোট নদী। দেখিতে দেখিতে হাইডেনবার্গে পৌছিয়াই সহরের দৃশ্য দেখিতে গেলাম। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় বহু দেশের লোক দেখিতে আসে। পড়ান দেখিলাম। ছেলে মেয়েরা একত্রে ক্লাশ করে। লাইব্রেরী দেখিলাম, কত পুস্তক—কত ছবি কি সুন্দর সাজান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অতি নিকটেই একটি বিরাট পাহাড়, পাহাড়ের নীচেই একটি নদী, নদীর দুই-ধারেই বাড়ী, কাছে কাছেই পুল আছে। নদীতে নৌকা, মটর বোট ও ছোট ছোট ষ্টীমারও দেখিলাম। আরও দেখিলাম দুই দিকেই দোকান, কত জিনিষ—এত হোটেল কি করিয়া চলে, কত খরচ পড়ে চিন্তা করিয়া কুল কিনারা পাইলাম না। রোম, ফ্লোরেন্স, ভেনিস, জুরিক, ভিয়েনা, মিউনিক, হাইডেনবার্গ প্রত্যেক সহরেই অফুরন্ত দোকান ও হোটেল! বিক্রিও খুব বেশী, হোটেলে স্থান নাই। লোক অসংখ্য। মিউনিক ষ্টেশনের একটি চুলকাটা ও দাড়ি কামানর সেলুনে খুব কমপক্ষে ৫০টি বসিবার স্থান। একটিও খালি নাই। নাপিত কামাইতেছে, ভাল পোষাক পরা, কি চমৎকার চেহারা, স্বাস্থ্যবান ও সুশ্রী। আমাদের দেশে ঐরূপ সুচেহারার সাহেব খুব কম দেখা যায়। ষ্টেশনেই সিনেমা চলিতেছে। ফলের দোকান, ফুলের দোকান, ষ্টেশনারী দোকান, ঔষধের দোকান, হোটেল যে কত তার সংখ্যা বলা কঠিন।

৮ই জুলাই বৃহস্পতিবার—মিউনিক ফিরিয়া আসিয়াছি। কেবল গাড়ীতে বসিয়া তন্ময় হইয়া মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতেছি ও মন আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে। মিউনিক শহরের প্রধান রেলষ্টেশনে একটি দুগ্ধের হোটেল আছে। শত শত লোক দুগ্ধ পান করিতেছে ঐ হোটেলে। দাম এক পোয়া গ্লাস গরম দুধ পাঁচ আনা, আধ সের দশ আনা। ঐ হোটেলে ঢুকিলেই জিজ্ঞাসা করে গরম দুধ চাই না ঠাণ্ডা দুধ চাই। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন—চমৎকার ব্যবস্থা।

মিউনিক হইতে ১১ই জুলাই রবিবার বেলা ১টায় বিমানে রওনা হইয়া বেলা ৩টায় বার্লিন পৌছিলাম। চমৎকার বিমান বন্দর। বিমানটি একেবারে সেডের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। ভয়ানক বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু এক ফোঁটাও জল গায় লাগিলনা। এজেন্টের লোক উপস্থিত ছিল—ট্যাক্সি ক'রে হোটেলে এলাম। আসিতে দুই দিকে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। পর্ব্বতের ন্যায় উচু ভগ্নস্তূপ, বড় বড়বাড়ী গত যুদ্ধে বোমায় চুরমার হইয়া এইরূপ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। আগে যে বিমান বন্দর ছিল তাহা এখন আমেরিকানদের অধিকারে। সেখানে সৈন্যদের থাকিবার ব্যবস্থা। নূতন হোটেলে আসিয়া শুইয়া পড়িলাম।

আজ ১২ই জুলাই সোমবার গাড়ীতে ১০ টায় বাহির হইয়া সহর দেখিলাম। বড় বড় রাস্তা ৪০০।৪৫০ ফুট চওড়া ৬০।৭০ ফুট চওড়া ফুটপাথ দুই দিকে, মাঝখানে ট্রাম। অতি বড় শহর বার্লিন। লম্বা ১৪।১৫ মাইল, চওড়া প্রায় সেইরূপ। কলিকাতা, বম্বে উহার পকেটে রাখা যায়। কত শত শত পার্ক। বিসমার্ক ষ্ট্রীটে বিসমার্কের পাথরের মূর্ত্তি (Statue) আছে। অনেক বাড়ী আমেরিকানরা প্রস্তুত করিয়াছে ও করিতেছে। কতক বাড়ীতে স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল ও পুস্তকালয় করিয়াছে। ইংরেজরা বার্লিনে বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই। কিন্তু রাশিয়ানরা তাহাদের

এলাকায় একেবারে প্রায় নূতন করিয়া শহর গড়িয়াছে। বার্লিনের এই ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করিয়া নূতন বাড়ী তৈয়ার করিতে বহু বর্ষ ও বহু অর্থ লাগিবে। মনে মনে ভাবিলাম এই কি সেই কাইজার, বিস্মার্ক, হিণ্ডেন্‌-বার্গ ও হিটলারের বার্লিন। মনে পড়িল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে—দুই পক্ষে বহু লোক হতাহত হইতেছে। ১৯১৬ সাল—যুদ্ধে ক্রাউনপ্রিন্স আহত হইয়াছেন। রক্তপাত হইতেছে। ডাক্তার রক্ত বন্ধ করিতে গেলে ক্রাউনপ্রিন্স ডাক্তারকে বলিয়াছিলেন "আমার দেহে ইংরেজ রক্ত যেটুকু আছে তাহা বাহির হইতে দাও।" ক্রাউনপ্রিন্স মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দৌহিত্র—কাইজারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। যে জাতি ও দেশ বহুদিন ধরিয়া সমগ্র ইউরোপের ভাগ্য নিয়ন্তা ছিল আজ সেই জাতির কি দুরবস্থা! পরাধীন তো বটেই—ভাগে ভাগে পরাধীন। যেমন পূর্ব্ব জার্ম্মানি ও পশ্চিম জার্ম্মানি—পূর্ব্ব বার্লিন ও পশ্চিম বার্লিন—সেখানে আবার আমেরিকান, ইংরেজ ও ফরাসী অধিকার। জোনের পর জোন। এখনও জার্ম্মানরা বলেন—"বার্লিনই স্বাধীনতার জন্মভূমি" (Berlin is the birth place of Freedom)। জাতি পরাধীন হইয়াছে সত্য কিন্তু উহা সাময়িক। সকলেই তাহা জানে। জাতির আলস্য নাই, সর্ব্বদাই কর্ম্মব্যস্ত। এই পরাধীনতা জার্ম্মান জাতি মানিয়া লয় নাই। ইহা বেশীদিন থাকিবেনা—থাকিতে পারে না। জার্ম্মান জাতি ও জার্ম্মানি বেশীদিন টুকরা টুকরা হইয়া থাকিবে না—তবে কবে কি ভাবে এক দেশ এক জাতি হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে তাহা বলা কঠিন।

অনেক রাস্তাঘাট, পার্ক, ময়দান, লতাপাতায় পরিশোভিত দোকানপাট, বড় বড় রাস্তায় হোটেল ইত্যাদি দেখিলাম। কিন্তু কত বড় বড় বাড়ী, গির্জ্জা, হাসপাতাল যে ভগ্নস্তূপের ভিতরে আছে তাহার আদি অন্ত নাই। ছোটবেলায় রামায়ণে পড়িয়াছিলাম সোনার লঙ্কাপুরী শ্রীরামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে ভস্মে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু বার্লিন ভস্ম হইয়া যায় নাই। তবে

সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। বড় বড় ইমারতের ভগ্নস্তূপ যাহা দেখিলাম তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে কেহই ধারণা করিতে পারিবেন না। এখানেও ইংরেজিতে কেউ কথা বলেনা ও বুঝেনা। যেখানে সম্ভব আমেরিকান টুরিষ্টদের সঙ্গে আমি মিশিয়া যাই। আমাকেও উহারা খুব খাতির করে—কারণ আমি ইংরেজিতে উহাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করি। ১৩ই জুলাই মঙ্গলবার আমি ও আরও ৮'জন আমেরিকান একটি গাড়ী করিয়া বহুস্থান দেখিয়াছিলাম। যে স্থানে কাইজার বাস করিতেন সেই রাজ প্রাসাদ, যুবরাজের প্রাসাদ, ভন হিণ্ডেনবার্গের বাসভবন ইত্যাদি দেখিয়া আসিলাম। যে প্রাসাদে ও যে স্থানে হিটলার আত্মহত্যা করিয়াছিলেন গাইড তাহা দেখাইলেন। এ সব জায়গা পূর্ব্ব বার্লিনে। কত কথাই মনে হইতে লাগিল।

দম্ভ বা লোভ, অহঙ্কার, অত্যাচার কিছুই ভাল নয়। সত্যযুগে শুম্ভ, নিশুম্ভ ও মহিষাসুরের দম্ভে উহারা ধ্বংস হইয়াছিল। ত্রেতাযুগে রাবণ দম্ভের জন্য সবংশে ধ্বংস হইয়াছিল। দ্বাপরে দুর্য্যোধন "বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী" এই দম্ভে ধ্বংস হইয়াছিল। আর কলিতে ঐ দম্ভে নেপোলিয়ান গেল, কাইজার গেল, হিটলার গেল, শুধু ধ্বংস হইয়াই গেল না—দেশ এবং জাতিকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিয়া গেল। ব্রহ্মাস্ত্র, পাশুপত, এটম বম, হাইড্রোজেন বম প্রভৃতি ধ্বংসই করিবে কিন্তু কিছুতেই শান্তি আসিবে না। তবে কিসে শান্তি আসিবে? মহাভারতে যে পথের নির্দ্দেশ আছে—গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে পথ দেখাইয়াছেন—কেবল সেই পথেই শান্তি আসিবে। শান্তি আসিবে প্রেমে, স্বার্থত্যাগে, সেবায়, ভালবাসায়, লোভশূন্যতায়, স্নেহে ও পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাসে। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তিতে, বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্যদেব, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী যে পথের নির্দ্দেশ দিয়াছেন কেবল সেই পথে। "নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" পরিত্রাণের আর কোন পথ নাই।

যে যে স্থান দেখিবার আছে দেখিতে চলিয়াছি। প্রাইভেট গাড়ী করিয়া রাশিয়ানদের অধিকৃত পূর্ব্ব বার্লিনে ঢুকিতে দেয় ও সমস্ত দেখিতে দেয়। এখানেও ঠিক পশ্চিম বার্লিনের মত। বড় বড় রাস্তা, বৃক্ষাদি শোভিত বহু পার্ক, খুব বড় মৃত রাশিয়ান সৈনিকদের স্মৃতিস্তম্ভ। সারি সারি শ্রেণীবদ্ধ সাজান বৃক্ষ সকল, মাঝখান দিয়া রাস্তা ও বড় বড় তুইটি দেখিবার মত উঁচু আছে। একটি ছোট নদী পূর্ব্ব ও পশ্চিম বার্লিনের ভিতর দিয়া গিয়াছে। মাঝে একটি হ্রদও আছে। আর আছে পর্ব্বত-মালার ন্যায় সাজান গত মহাযুদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন, ভগ্ন ইষ্টকের স্তূপ কি পর্ব্বত বলা যায় না। পশ্চিম ও পূর্ব্ব বার্লিনের ঠিক একই অবস্থা। এই ভগ্নস্তূপ পরিষ্কার করা কষ্টকর, ব্যায়সাধ্য এবং সময় সাপেক্ষ। সমগ্র জার্ম্মেনির শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজের অধিকারে এবং শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ একা রাশিয়ার অধিকারে। যদিও ইহাদের সকলেই জার্ম্মানদের সন্তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করিতেছে উহাতে কোন ফল হয় নাই। সমস্ত জার্ম্মান জাতি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় বাহিরে শান্ত মনে হইতেছে কিন্তু ভিতরে ভিতরে আগুণ জ্বলিতেছে। জগদীশ্বর ভিন্ন আর কেহই জানেন না কি ভাবে এবং কবে জার্ম্মেনি হইতে এই বহির্শক্তি গুলির অন্যায় অধিকার শেষ হইবে।

বার্লিনে ৯টি রেল ষ্টেশন ছিল। এখনও ষ্টেশন আছে, গাড়ীও চলে তবে এখানেও ভাগ—বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ব্যবস্থা। দেশ বিভাগের যে কি তুঃখ ও বেদনা তাহা বিভক্ত পূর্ব্ব বঙ্গের অধিবাসী আমরা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছি। তাই বর্ত্তমান জার্ম্মেনির অবস্থায় আমাদের তুঃখ ও সহানুভূতি স্বাভাবিক।

১৪ই জুলাই বুধবার নিজেই একাকী পদব্রজে রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছি বড় বড় ইমারত দেখিতেছি। ইটালি হইতে জার্ম্মেনি পর্য্যন্ত, অধিকাংশ

ইমারতের ছাদের উপরিভাগ দোচালা বা চারিচালা টালি দিয়া আবৃত, আমাদের দেশের মতন পিটান ছাদ নয়। আজকাল আমেরিকান ষ্টাইলে কলিকাতার ৮নং জেটীর সামনে গভর্ণমেণ্ট যে ২টি নূতন বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছেন ঠিক ঐ রকম বাড়ী জার্ম্মেনিতেও তৈয়ারী হইতেছে। বার্লিন সমতল ভূমির উপর প্রকাণ্ড শহর।

১৫ই জুলাই বৃহস্পতিবার সকাল বেলা সাড়ে সাতটা হইতে ১০টা অবধি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া হোটেলে আসিয়াছি। বৈকালে বিমানে রওনা হইয়া রাত্রি ৮-১০ মিনিটে প্যারিস পৌঁছিলাম। রাত্রি ৯টায় হোটেলে পৌঁছিয়াই শুইয়া পড়িলাম।

১৬ই জুলাই শুক্রবার সকাল বেলা ৯-৩০ মিনিটে কুক কোম্পানির অফিসে গিয়া টিকিট কিনিয়া ১০-৩০ মিনিটের গাড়ীতে করিয়া শহর দর্শনে বাহির হইলাম। গাইড ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেছিলেন, কিন্তু আমি দেখিতেছি বেশী ও শুনিতেছি কম। এখানকার রাস্তাও ভিয়েনা এবং বার্লিনের মত চওড়া, দুই দিকেই বৃক্ষাদি শোভিত—অনেক পার্ক, স্কোয়ার, উদ্যান ইত্যাদি দেখিলাম। তারপর মিউজিয়মে ঢুকিলাম। ঠিক রোমের মিউজিয়মের অবিকল নকল। বড় বড় পাথরের মূর্ত্তি কি সুন্দর সুদক্ষ ও সুনিপুণ কারিগরের হাতে গড়া, আর বড় বড় ও সুন্দর ছবি। ভাল ভাল ছবির নিকট বহু পুরুষ ও মেয়ে চিত্রকর বসিয়া সুনিপুণ ভাবে ছবির নকল করিতেছে। তাহাদের হাতে আঁকা ছবি হুবহু মিউজিয়মের দেওয়ালে টাঙ্গান ছবির ন্যায়। ধন্য চিত্রকর! কত শত সহস্র লোকে দেখিতেছে কিন্তু শিল্পীরা সুনিপুণ ভাবে ছবি দেখিয়াই ছবি তুলিতেছে। তারপর দেখিলাম প্যারিসের সৌন্দর্য্য একটুও নষ্ট হয় নাই। গত মহাযুদ্ধে প্যারিসের কোন ক্ষতি হয় নাই। কারণ ইহা অরক্ষিত সহর (Open City) বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল। একখানা পাথর কিংবা

একখানা ইটও স্থানচ্যুত হয় নাই। গির্জ্জা, বড় বড় বাড়ী, ব্যাঙ্ক যেন সদর্পে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। মিউজিয়ম, সিনেমা, শহর, পার্ক একেবারে আগের মতই আছে। এখানকার মিউজিয়মের একদিকে নদী, অন্যদিকে পার্ক ও চারিদিকেই বড় বড় রাস্তা বৃক্ষাদি শোভিত---যেন সাজান বাগান মনে হয়। প্যারী নগরী যেন সদর্পে পরিষ্কার রঙ্গীন মহামূল্য বেনারসী সাড়ী, সায়া, সেমিজ ও ব্লাউজ, হীরা, মণিমাণিক্য ও স্বর্ণালঙ্কারে শোভিত হইয়া যুবতী নব বধূর ন্যায় দাঁড়াইয়া সদ্য বিধবা থান কাপড় পরা বার্লিনকে দেখিতেছে ও মুচকিয়া মুচকিয়া হাসিতেছে। প্যারিসে বসিয়া এই ডায়েরি আমি যখন লিখিতেছি, তখন বার্লিনের সহিত ইহার তুলনা করিয়া আমি একেবারে দুঃখে ও কষ্টে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি। আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছে আর জগদীশ্বরকে স্মরণ করিতেছি। স্মরণ করিতেছি তাঁর কি বিচিত্র লীলা।

এই ডায়েরি লিখিতে লিখিতে ইউরোপের দেশ দেখিতে দেখিতে কেবল ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি—"হে ভগবান, শক্তি দাও—সাহস দাও। সামর্থ্য নাই, স্বাস্থ্য নাই, অর্থ নাই, তবুও যেন উৎসাহহীন না হই। যেন দেশের, দশের ও দরিদ্রের সেবার জন্য যে কোন বৃহৎ কাজ করিতে অগ্রসর হইতে পারি। যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিব তাহা হইতে যেন পশ্চাৎপদ না হই।'

১৭ই জুলাই শনিবার। ভার্সাইয়ের রাজ প্রাসাদ প্যারিস হইতে ১৭ মাইল দূরে। আগে ছিল রাজ প্রাসাদ এখন মিউজিয়ম। এই প্রাসাদে বসিয়া বিশ্ববিখ্যাত ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র দর্শক এই মিউজিয়মটি দেখিতেছেন। চারিদিকেই বাগান, ছোট ছোট হ্রদ। প্রাসাদের মধ্যে শ্বেত পাথরের কত রকম মূর্ত্তি, বড় বড় ছবি। একটি ছবি নেপোলিয়ানের রাজ মুকুট গ্রহণের সময়ের। সম্রাজ্ঞী নতজানু হইয়াছেন, চারিদিকে প্রধান প্রধান পরিষদবর্গ এবং রাজ পরিবারের লোক, কি চমৎকার দৃশ্য। ছবিটি ৪০ ফুট লম্বা ও ২৫ ফুট চওড়া। ১৮ বৎসর লাগিয়াছিল

একটি শিল্পীর এই ছবিটি আঁকিতে। তাঁর নামও খোদিত আছে। আর একটি ছবি হইতেছে নেপোলিয়নের যুদ্ধে জয় লাভের। জয় লাভ কি ভীষণ রোমাঞ্চকর দৃশ্য---কি ভয়ঙ্কর রণস্থল। ছবিটি ৪০ ফুট লম্বা ও ২৫ ফুট চওড়া। কেবলই ছবির পর ছবি। কত ধৈর্য্য ধরিয়া এই সকল ছবি শিল্পীরা আঁকিয়াছিলেন। কি অসীম সাধনা, ত্যাগ ও দেশপ্রেম। তার-পর কত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর ছবি, তাহাদের বসিবার ঘর, স্নান ঘর, হল ঘর, গ্যালারী, সমস্ত সাজান আছে। ৪০০।৫০০ বৎসরের পুরাতন ঘর, এর উপরের দিকে ছবি আঁকা দেখিয়া মনে হয় এই বুঝি শিল্পী কাজ শেষ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন। এই স্থানেই ফরাসী বিপ্লব সুরু হইয়াছিল। এই সৌধের যে বহুস্থান নষ্ট করা হইয়াছিল তাহা এখনও মেরামত হইতেছে। দেখিয়া আর শেষ নাই। চতুর্দ্দিকেই কেবল ফুল বাগান, বৃক্ষরাজি সারি সারি সাজান কত যে ফটোগ্রাফার কত যে ছবি তুলিতেছে তাহারও শেষ নাই। প্যারিস হইতে ভার্সাই যাওয়ার পথে উভয়দিকে সারি সারি বৃক্ষাদি শোভিত—মাঝখান দিয়া রাস্তা আবার মাঝে মাঝে বড় বড় পার্ক। প্যারিস সমতল ভূমি নয়—পাহাড়ী জায়গা কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। চারি-দিকেই মনোরম দৃশ্য। সিন নদী ঘুরিয়া ঘুরিয়া সহরকে বেষ্টন করিয়াছে। নদীর দুই ধারেই প্যারিস শহর। ২৭টি পুল দুই অংশের যোগ সাধন করিয়াছে। ৭টি রেল ষ্টেশন, ট্রাম নাই, সকলেরই বাসে অথবা ট্যাক্সিতে যাতায়াত করিতে হয়। কত যে মটর গাড়ী তার আদি অন্ত নাই। শহরের বুকের উপর কত বড় বড় পার্ক, এর মধ্যে লোকের বসিবার স্থান, বিশ্রামের স্থান, কিন্তু সকলেই কর্ম্মব্যস্ত—যেন কাহারও আলস্য নাই। রোম হইতে আরম্ভ করিয়া ভেনিস, জুরিক, ভিয়েনা, মিউনিক, বার্লিন ও প্যারিস—সব জায়গাতেই দেখিলাম মেয়েরাও পুরুষের সমান কাজ করিতেছে। কেহ বসিয়া থাকেনা। সকলেরই কাজ করিবার সমান অধিকার ও সমান সুযোগ।

১৮ই জুলাই রবিবার প্যারিস হইতে ৪০ মাইল দূরে কন্‌টেনব্লু দেখিতে ১০-৩০ মিনিটে রওনা হইলাম। চমৎকার চওড়া রাস্তা, দুই দিক সারি সারি বৃক্ষাদি শোভিত, তার নীচেই শস্যক্ষেত্র অর্থাৎ গমের জমি। এবার যে গম হইয়াছে দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল; আর প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি যেন এখানেই প্রকাশ হইয়াছে। কত বন, কত জঙ্গল, কত শিকারের স্থান। দেখিতে দেখিতে ঐ কন্‌টেনব্লুতে পৌছিয়া দেখি আবার সেই মিউজিয়ম। এ স্থানটিই ফরসী সম্রাটদের গ্রীষ্মকালের আবাস ছিল। চারিদিকে সাজান বাগান, মাঠ, হ্রদ। হ্রদে অফুরন্ত মাছ। আবার প্রাসাদের ভিতর হলঘর; বিচারের ঘর, কত বড় বড় ছবি, ছবির গ্যালারী, নেপোলিয়নের শয়ন ঘর, রাণীদের শয়ন ঘর, স্নানের ঘর, হুবহু সাজান আছে। সমস্ত ছবি যেন সোনার ফ্রেমে বাঁধান। এই রাস্তাটির দুইদিকে বৃক্ষরাজি সাজান বাগান। একস্থানে অনেক পাথর ও বালি দেখিয়া আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম যে ৩০০ বৎসর আগে উহা সমুদ্রের অংশ ছিল, এখন প্রস্তরময় হইয়া পাহাড় হইয়াছে। আবার তাহার নিকট বিরাট বন। এখানে সম্রাটেরা হরিণ শিকার করিতেন। মাত্র ১৭।১৮ মাইল, কন্‌টেনব্লু ৪০ মাইল। পৃথক পৃথক রাস্তা, সৌন্দর্য্যের আকর বাগানগুলি যেন নন্দন কানন। রাস্তাগুলি বড় বড় ঠিক ভিয়েনা ও বার্লিনের মতন।

১৯শে জুলাই সোমবার কেবলই রাস্তা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতেছি, এমন সময় একটি লোক বলিল—Are you lost? মনে পড়িল বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার কথা "পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?" আমি বলিলাম "না"। তখন সে চলিয়া গেল। যাহা দেখিলাম তাহা যে কত শতাব্দীর শিল্পীরা ধীরভাবে একাগ্র চিত্তে তন্ময় হইয়া সাধনা করিয়া সিদ্ধলাভ করিয়াছিলেন তাহা ভাবিবার বিষয় বটে।

২০।২১শে জুলাই প্যারিস হইতে ব্রাসেলস্ হইয়া তারপর ট্রেণযোগে অষ্টেণ্ড, অষ্টেণ্ড হইতে ষ্টীমারযোগে জগৎ-বিখ্যাত ইংরেজ জাতির বাসভূমি

ইংলণ্ড রওনা হইলাম। বেলা প্রায় ২টায় ষ্টীমারে উঠিলাম। প্রকাণ্ড সমুদ্রগামী ষ্টীমার। প্রথম শ্রেণীর টিকিট ছিল—কাজেই সমুদ্রের দিকে মুখ করিয়া বসিবার চেয়ার ছিল। প্রায় পৌনে তিনটায় জাহাজ ছাড়িল। এই সেই বিখ্যাত ইংলিস্ চ্যানেল---একূল ওকূল নাই---যাহা বহুবার ইংরেজ জাতিকে নিশ্চিত ধ্বংস হইতে বাঁচাইয়াছে। বাতাস নাই, রৌদ্র, কাজেই সমুদ্র শান্ত ছিল। বসিয়া বসিয়া দেখিতে দেখিতে বহু পুরাতন কথা মনে পড়িল। সেই সিরাজগঞ্জ, গোয়ালন্দের কথা, পদ্মা-যমুনার সঙ্গমস্থলের কথা, সেই বর্ষাকালের কথা। সন্ধ্যা ৭টায় জাহাজ ডোভার পৌঁছিল। মুটে নাই যার যার সুটকেস্ তাহাকেই বহন করিতে হইল। চেকিংয়ে ভয়ানক কড়াকড়ি। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় ডোভার হইতে ট্রেন ছাড়িল। ডোভার হইতে লণ্ডন আসিতে ডান দিকে পাহাড়, বামদিকে সমুদ্র। তারপর দুইদিকে উচ্চভূমি বা ছোট ছোট পাহাড়, মাঝখান দিয়া রেলপথ। রেলপথ উচ্চভূমি দিয়া গিয়াছে। ডাইনে বামে ইংরেজ পল্লী, ইটের দেওয়াল ও টালির ছাদ। আগাগোড়া সমস্ত পল্লীই বিজলি বাতিতে উজ্জ্বল ও আলোকিত। সন্ধ্যা ৯টা, তখনও সূর্য্য অস্ত যায় নাই। ট্রেণ লণ্ডনে পৌছিল। ষ্টেশন হইতে ইম্পিরিয়াল হোটেলে আসিতেই পথে ইতিহাস প্রসিদ্ধ বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ। তার সামনে প্রকাণ্ড চত্বর। রাস্তার মাঝখানে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রকাণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তি, বামে ভিক্টর পার্ক, তাহার পর হোটেলে পৌঁছিলাম।

২৩শে জুলাই শুক্রবার বেলা সাড়ে নয়টায় বাহির হইয়া বাকিংহাম প্রাসাদ দেখিলাম, পার্কের পর পার্ক, খুব বড় বড় পার্ক, সারি সারি সাজান বৃক্ষ, কত যে লতা পাতায় ফুলে ভর্ত্তি বলা যায় না। বড় বড় রাস্তা, বড় বড় নামকরা দোকান দেখিতে দেখিতে টাউয়ার হিলে ঢুকিতেই দেখিলাম প্রসিদ্ধ টাউয়ার অফ লণ্ডন। এই বাড়ীর কতকটা অংশ গত যুদ্ধের সময় বোমার আঘাতে চুরমার হইয়া ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে। তাহার পর টাউয়ার দেখিলাম।

স্বর্ণ-রৌপ্যে জড়িত রথচক্রের ন্যায় চারিদিক দেখিবার টাউয়ার হাউস্। বড় বড় চত্বর দেখিয়া বাহির হইয়াই দেখি টেমস্ নদী তাহার নীচু দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কত জাহাজ, ষ্টীমার, মটর বোট নদীতে চলিতেছে এবং নদীর দুই পারেই এই সব দৃশ্য দেখিবার সুব্যবস্থা আছে। টেমসের উপর ২৭টি পুল আছে। শহরের এই অংশের নাম লণ্ডন পোর্ট। আমরা টাউয়ারের পুল পার হইয়া অন্য পারে গেলাম। তারপর আবার লণ্ডন ব্রীজ পার হইয়া লণ্ডন সহরের ভিতর দিয়া পশ্চিম লণ্ডন হিল দেখিলাম। বড় বড় মিউজিয়ম, বড় বড় বৃক্ষাদিতে সাজান বাগান, বাগানের পর বাগান, পার্কের পর পার্ক দেখিয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ও কিংস কলেজ দেখিলাম। দেখিলাম অনেক ধনীলোক তাহাদের বাসগৃহকে মিউজিয়ম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করিয়া দিয়াছেন। পরে প্রসিদ্ধ হাইড পার্কে ঢুকিলাম—প্রকাণ্ড পার্ক। বৃক্ষাদি সাজান, মাঝখান দিয়া প্রকাণ্ড খাল ও হ্রদ। এপার ওপার হইবার পুল আছে। মটর গাড়ী ও বাস যাইবার প্রকাণ্ড বড় বড় রাস্তা—বড় বড় পার্ক। জনসাধারণের বসিবার সুব্যবস্থা, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের বেড়াইবার, খেলা করিবার খুব ভাল বন্দোবস্ত। লণ্ডনের পার্কগুলি খুব বড় ও ভাল। ভিয়েনা ও বার্লিনের মতই। কিন্তু রাস্তাগুলি ভিয়েনা কিংবা বার্লিনের মত বড় নয়—কলিকাতার চৌরঙ্গী ও ডালহৌসি স্কোয়ারের রাস্তার মত। রাস্তা বৃক্ষাদিতেও সাজান নয়। তবে যে যে রাস্তা পার্কের ভিতর দিয়া গিয়াছে---সেগুলি অবশ্যই গাছে গাছে সাজান।

বাকিংহাম প্রাসাদের নিকট আরও তিনটি পার্কের ভিতর রাজপ্রাসাদ আছে। গত যুদ্ধে বোমা বর্ষণের সময় রাজা, রাণী ও রাজ পরিবারবর্গ সেই সকল বাগান বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এখনও লণ্ডনের সমস্ত বড় বড় বাড়ীতে কালো রং দেওয়া আছে। বাকিংহাম প্রাসাদেও কালো রং। গত যুদ্ধের সময় বোমা বর্ষণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য ঐ রং করা হইয়াছিল। সেই অবস্থায় আছে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে অনেক বড় বড়

ব্যাঙ্ক—যথা লয়েডস্ ব্যাঙ্ক, মিডল্যাণ্ড ব্যাঙ্ক, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ইত্যাদি। হোটেল, ব্যাঙ্ক, থিয়েটার, সিনেমা, ফলের দোকান, মটর গাড়ীর দোকান, কাপড়, জামা, ঘড়ি ও জুতার দোকান, কত যে সাজান দোকান দেখিবার মতন বটে। কি করিয়া এই সকল দোকানের খরচ চলে ধারণা করিতে পারিলাম না। যুদ্ধের আগে এই লণ্ডন শহরে সুচ্যগ্র ভূমিও খালি ছিল না। এখন দেখিলাম বহু জায়গা খালি, শত শত বাড়ী বোমার আঘাতে ধ্বংস ও নষ্ট হইয়াছে। বার্লিন ও ভিয়েনার পরই লণ্ডন শহরের ক্ষতি হইয়াছে বেশী। ইহাই আমার ধারণা। তবে বহু নূতন বাড়ী লণ্ডনে তৈয়ারী হইতেছে ; পুরাণ বাড়ী মেরামত হইতেছে, আর যেগুলি পর্ব্বতের ন্যায় ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে সেগুলিও ঢাকা দিয়া বিজ্ঞাপনের স্থান হিসাবে ব্যবহার করা হইতেছে। ভিয়েনা, জুরিক, মিউনিক, হাইডেলবার্গ, বার্লিন, প্যারিসের মত লণ্ডনেও ছাদের উপর দোচালা বা চারিচালা টালির ঘর। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম শীতকালে যে রকম বরফ পড়ে তাহাতে অন্য কোন প্রকার ছাদ টিকেনা। ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে বহু দোচালা, চারিচালা ঘর আছে অর্থাৎ জল চালে পড়িবামাত্র নীচে গিয়া পড়ে, জমিতে পারেনা। আজ সমস্ত দিন গাড়ীতে ঘুরিয়া সন্ধ্যা ৭টায় হোটেলে ফিরিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করিতেছি। কিন্তু ডায়েরি লেখা চলিতেছে।

ইউরোপ সুকাজ কুকাজ উভয়েরই দেশ। মদ, মাংস, মেয়ে মানুষের সঙ্গে অবাধ মিলনের দেশ। আবার দেশের জন্য মেয়ে পুরুষের অফুরন্ত ত্যাগের দেশ—কর্ম্মীর দেশ—সাধনার দেশ।

২৪শে জুলাই শনিবার আমার পক্ষে অতি স্মরণীয় দিন। কারণ ঐ দিনে হোয়াইট হাউস, ডাউনিং ষ্ট্রীট, প্রিভিকাউন্সিল হাউস, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড, লণ্ডন মিউজিয়ম, হাউস অফ পার্লিয়ামেন্ট, কর্পোরেশন হল, ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবি আবার টেমস্ নদী, লণ্ডন বন্দর, পুল ও বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি দেখিলাম।

পার্লিয়ামেণ্ট ভবন প্রকাণ্ড বাড়ী, সামনে চত্বর, ঢুকিলেই মিউজিয়মের ন্যায় বোধ হয়, কত পাথরের মূর্ত্তি, তৈল চিত্র, সুন্দর বাঁধান যেন স্বর্ণখচিত, ঝক্ ঝক্ করিতেছে। তারপর হাউস অফ লর্ডস্, সেখানে কেবল বড়লোক, জমিদার সাহেবদের বসিবার বন্দোবস্ত, লম্বা লম্বা বেঞ্চ, ভেলভেটে মোড়া গদী, চ্যান্সেলারের বসিবার রাজকীয় আসন। এই স্থানে বসিয়া এক বৎসরের শাসন কার্য্যের নীতি রাণী ঘোষণা করেন। হাউস অফ লর্ডের পরে বিরাট হল, তারপর হাউস অফ কমন্সের হল, এখানেও লর্ড দের বসিবার আসনের মতন ভেলভেটে মোড়া গদী। লর্ড ও কমন্সের আসনের কোনই পার্থক্য নাই, একই প্রকার। এখানেই স্পীকারের আসন, আসনের সামনে সভ্যদের বক্তৃতা করিবার স্থান।

লণ্ডন শহর শক্ত পাহাড়ে মাটির উপর অবস্থিত। ২০০।৩০০ ফুট নীচেও জল পাওয়া যায় না। কাজেই এখানকার একটি প্রধান সুবিধা মাটির নীচে রেল---যাহাকে টিউব রেল বলে। সুড়ঙ্গ পথে বিদ্যুতে চলে। একটি স্কোয়ার হইতে অন্য একটি স্কোয়ার বা এক ষ্টেশন হইতে অন্য একটি ষ্টেশনে ট্রামের মত কম ভাড়ায় যাতায়াত করা যায়। মহা সুবিধা।

কত কি দেখিলাম, কত কি লিখিলাম, বিলাসিতার লীলাভূমি, কর্ম্মের লীলাভূমি—মেয়ে পুরুষের সমান অধিকার ও কাজের কর্ম্মভূমি। উপার্জ্জনও যেমন—খরচও তেমন!

যেখানেই যাই নিজের দেশ ভারতবর্ষকে ভুলিতে পারিনা। আর ভুলিতে পারিনা ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা সকল দেশের রাণী আমার এই বঙ্গমাতাকে। এর মত দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। এখানে আছে গঙ্গা, যমুনা, পদ্মা, মেঘনা, দামোদর, ব্রহ্মপুত্র! জীবন ধারণের ব্যয়ও এখানে খুব কম। ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, রিকসা, সিনেমা, সকলই পাশ্চাত্যের তুলনায় সস্তা। এই ভারতের নরনারী সকলেই আজ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছে।

ইহার সুনাম পৃথিবীতে প্রত্যহই সকল জাতি ঘোষণা করিতেছে। বিশেষতঃ পণ্ডিত নেহেরুর স্বাধীন বৈদেশিক নীতি সর্ব্বত্র শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতেছে। তবে কেহ কেহ ইহাকে "Clever Man's Policy" বলিয়া থাকেন। ভারতবর্ষ যে আমেরিকাকে এদেশে ঘাঁটি করিতে দেয় নাই, সেজন্য সকলেই ভারতবর্ষকে ধন্য ধন্য করিতেছে। ধন্য পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু। ধন্য তোমার নিজস্ব বৈদেশিক নীতি। তোমার মতন যোগ্য দেশনায়ক আর কোন দেশে আছে ? আমাকে টুরিষ্টরা কেহ কেহ ইণ্ডিয়া বলিয়া ডাকিত এবং কেহ কেহ নেহেরুজী বলিয়া ডাকিত। তাই আমিও ইউরোপ ঘুরিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেছি, আরও ধন্য মনে করিতেছি এই বাঙ্গলা দেশকে—আর বাঙ্গলা দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া আমিও ধন্য। এমন দেশটি আর কোথাও নাই। এদেশে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, অরুন্ধুতী, শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও গীতার শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা ত্যাগের, আদর্শের দেশ। ত্যাগেই অমৃতত্ব—ত্যাগেই অমরত্ব—ত্যাগেই শান্তি, এই ঋষিবাক্য উচ্চারণ করিয়া এই ডায়েরি শেষ করিলাম। **বন্দেমাতরম্।**

Jagat Ganga Sebasadan
Shishu Mangal

(A brief history)

The Jagat Ganga Seva Sadan Shishu Mangal Maternity Home & Hospital was opened by H. E. the Governor on the 9th December, 1951 in a three-storeyed building at 111 A & B, Rashbehari Avenue, valued at Rs. 3,25,000/-, so generously made over to the Trustees by the Settlor, Sri Kshirode Chandra Ghosh, to perpetuate the memory of his parents. Besides the building and vacant land comprised in the premises, the Settlor has made over cash and other properties worth about Rs. 3 lakhs which enabled the Trustees to start and run a well-furnished and well-equipped modern Maternity Home & Hospital from January, 1952.

The Trustees maintain a Maternity Home with beds for rendering indoor medical help in maternity cases. They also run an outdoor dispensary for women, specially in relation to ante-natal and post-natal cases as well as other gynaecological cases and also for children's diseases and allied ailments.

At present, there are 26 beds in the hospital viz. 4 cabins, 15 paying beds, 5 free beds and 2 isolation.

The hospital is manned by well-trained Gynaecologists and Medical Officers with special training in Obstetrics and Gynaecology, a Senior Consulting Visiting Surgeon, a qualified and experienced R. M. O., a Pathologist, an Anaesthetist and a Medical Officer for the out-door. The hospital is also provided with adequate nursing and menial staff.

During the year 1953-54, the total number of patients who visited the out-patients department of this hospital was 2922.

During the same year, the number of patients admitted to this Maternity Home & Hospital was 750 as against 561 in 1952-53.

The total number of delivery cases in 1953-54 were 695 as against 486 in the previous year.

There were 39 cases of operation during the year as against 16 cases of operation in the previous year.

There was no case of maternal mortality during the year.

During the year under review, the total receipts amounted to Rs. 28,537-14-6 of which Rs. 22,450/- came from paying beds. The grant from the Corporation of Calcutta was for Rs 2,000/- less outstanding rates.

Donation from H. E. the Governor of West Bengal and from other sources amounted to Rs. 6,087-14-6.

The total expenditure for running the Home and Hospital for the year amounted to Rs. 34,129/12/3.

It may be pointed out that the deficit in the working of the Institution is always made up by the Donor, Sri Kshirode Chandra Ghosh.

The opinion of eminent visitors who kindly inspected the Institution bears testimony to the good work done. A few extracts are given below :—

Sir Jehangir Ghandy, Director, Tata Industries Ltd. on 25.3. 52 wrote :—

" The arrangements at the Shishu Mangal for the care of the expectant mothers, mothers and babies are quite impressive. There is all round efficiency......"

Dr. A. D. Mukherjee, Minister of State, Government of West Bengal on 2-9-52 remarked :—

" We were impressed by the very good work the Institute is doing in the locality........."

Dr. B. C. Das Gupta, Director of Health Services, Govt. of West Bengal on 10. 9. 52 wrote :—

"......work done by the Institution so far has been very good both in quality and quantity and it has been possible only because of the devoted and selfless service given by the staff......"

The Board of Trustees consists of the following persons :—

Upendra Nath Bose.
Hony. Secretary.